ইতিহাসের পরিক্রমায় যেসব ক্ষণজন্মা নেতৃত্বের অবদানে ও যোগ্যতায় এগিয়ে যায় একটি দেশ, তাজউদ্দীন আহমদ তেমনই একজন নেতা। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের প্রাণভোমরা, অস্থায়ী মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তিনি। দুরন্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের চেয়েও আকস্মিক ও ভয়ংকর চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের সময়ে বিশৃঙ্খল জাতির কান্ডারী তিনি। মুক্তিকামী জনগণের প্রধান দিক নির্দেশক ও একান্ত ভরসার স্থল তিনি। বঙ্গবন্ধুর একান্ত অনুগত, দেশপ্রেমিক এই নেতা যুদ্ধের অব্যবহিত পরে বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে দেন প্রধানমন্ত্রীর পদ এবং অলঙ্কৃত করেন অর্থমন্ত্রীর পদটি।

মুক্তিসংগ্রামের বহু পূর্ব হতেই, যখন জাতি প্রস্তুত হচ্ছিল শোষনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার জন্য, তখন থেকেই, তিনি কাজ শুরু করেন জাতির শাসনতান্ত্রিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য। সে কথার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর ডায়েরীতে, লেখনী, কর্মপন্থা ও বক্তব্যে। মুজিবনগর সরকার বা স্বাধীনতা-উত্তর সরকারে তিনি পান দেশ নিয়ে তাঁর সুদীর্ঘ চিন্তা-সাধনা বাস্তবায়নের সুযোগ।

বাংলাদেশ তখন সদ্য স্বাধীন একটি দেশ। যুদ্ধের নারকীয়তায় বিধ্বস্ত একটি দেশ। সুপরিকল্পিতভাবে একটি জাতিকে পঙ্গু করে দেয়ার ষড়যন্ত্রের শিকার একটি দেশ। সেরকম সঙ্কটময়, প্রতিকূল একটি সময়ে তাজউদ্দীন আহমদ শুরু করেছিলেন তাঁর কাজ। স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন বাংলাদেশকে।

স্বাধীনতার পর খুব একটি বেশি সময় পার করেনি বাংলাদেশ। তার ওপর এখনো কার্যকর একটি সদ্য স্বাধীন দেশের ওপর ঘটতে থাকা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলো। এখনো স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নে অনেকটাই পিছিয়ে বাংলাদেশ।

এমন অবস্থায়, এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য, সুশাসন প্রতিষ্ঠায়, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে তাজউদ্দীন আহমদের পন্থা ও বর্তমান প্রেক্ষাপটে তার প্রয়োজনীয়তা নিরুপন।

<u>স্বাধীনতা উত্তর ও বর্তমান বাংলাদেশ এবং তাজউদ্দীন আহমদঃ</u>

ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র- ১৯৭২ এর সংবিধানে উল্লেখিত এই চারটি মূলনীতিই মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তি। কিন্তু, গণমানুষের প্রেক্ষিতে তার বিস্তৃতি অনেক বিশাল।

meine schrift

দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাংলার সাধারণ মানুষের প্রধান অভিজ্ঞতা ছিল, শোষণ, বৈষম্য ,নিপীড়ন ও স্বাধিকার-বঞ্চনা। বাংলার মানুষ বঞ্চিত ছিল তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার তথা রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে। এর মধ্যে পড়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, জনগণের অংশগ্রহণে জনগণের সরকার গঠনের অধিকার, জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের অধিকার।

সমস্ত উপনিবেশের পত্তন- ই হয় ঔপনিবেশিক শক্তির অর্থনৈতিক সুবিধা ও উপনিবেশের সম্পদ আত্মসাতের জন্য। তাই বাংলাদেশ ঔপনিবেশিক আমলে চুড়ান্ত অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হয়েছে। এই শোষনের ফলাফলের পরিচয় পাওয়া যায় বাংলার শেষ ব্রিটিশ গভর্নর উইলিয়াম বারোসের বক্তব্যে,

“বাংলা বিভক্ত হলে তা হবে পৃথিবীর অন্যতম “কৃষি বস্তি”” [1]

পাকিস্তান আমলেও সেই ধারা অব্যাহত থাকে, তার ওপর যুক্ত হয় আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি। তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাজউদ্দীন আহমদের লেখা থেকেইঃ

“বর্তমান প্রশাসন পুরোপুরি দুর্নীতিবাজ। কর্মকর্তারা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য (পাকিস্তানের) স্বার্থ বিকিয়ে দিতে দ্বিধা করেন না। পদস্থ কর্মকর্তারা এ ধরনের কাজের সাথে জড়িত। সাধারণ মানুষ উভভ পর্যায়ের নাগাল পান না। আর যারা সেটা পাবে, সেসব লোকেরা আসলে উচ্চ পর্যায়ের সাথে হাত মিলিয়ে... রক্ত চুষে খাচ্ছে...ধনীরা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে উচ্চবাচ্য করে না। আর নিপীড়নের কারণে মুখ খুলতে পারে না সাধারণ মানুষ।“[2]

ইংরেজ ও পাকিস্তানি-উভয় ঔপনিবেশিক আমলেই বিদেশী পুঁজিপতিরা বাংলাদেশের সম্পদ পাচার করত নিজ দেশে। ফলে গড়ে ওঠা শিল্পগুলো ছিল তাদেরই হাতে। এতে জনগণের মালিকানা ছিল নগন্য।

এছাড়া সমস্ত পাঁচশালা পরিকল্পনা বা বাজেটে পূর্ব পাকিস্তান বিশেষত সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হত।

শাসনব্যবস্থা মূলত ছিল স্বৈরতান্ত্রিক। ব্রিটিশরাজের কথা বলাই বাহুল্য। আর পাকিস্তান সময়ে অক্টোবর ১৯৫৮ থেকে ২৫শে মার্চ ১৯৭০ পর্যন্ত আইয়ুব খান এবং তার পর থেকে ২৫ শে মার্চ ১৯৭১ পর্যন্ত ইয়াহিয়া খান অর্থাৎ প্রায় ১৩ বছর ছিল সামরিক ও স্বৈরশাসন।[3] এছাড়া ১৯৪৭ থেকে

[1] “তাজউদ্দীন আহমদঃ বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও তারপর”; কামাল হোসেন;অক্টোবর ২০০৮; পৃঃ ৫০১

[2] “তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরী”; ১৯.০৩.৫০;২য় খন্ড; প্রতিভাষ প্রকাশনী।

[3] http://newsletters.ahrchk.net/qaumi/mainfile.php/The+Ayub+Khan+Regime/50/

meine schrift

১৯৫৮ পর্যন্ত পাকিস্তানের কোন সর্বস্বীকৃত সংবিধান রচিত হয় নি। আইয়ুব খান এসে উপহার দেয় মৌলিক গণতন্ত্র ও প্রবঞ্চণামূলক সংবিধান।

সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ নীতি ছিল "বিভাজন ও শাসন" (Divide and Rule), যার ফলশ্রুতি হল সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও দাঙ্গা। কুখ্যাত কোলকাতা ও ঢাকার দাঙ্গা যার প্রমাণ। এবং সবচেয়ে বড় ফলাফল হল ভারত ও বাংলা বিভাজন আর ধর্মভিত্তিক রাস্ট্র পাকিস্তানের উদ্ভব। বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য বিনষ্টে তৎপর ছিল পাকিস্তানি প্রশাসন।

এরকম আরো অজস্র প্রতিকূলতা, শোষন, বৈষম্য আর নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তি পেতেই হয়েছিল মুক্তিসংগ্রাম।

মুক্তিসংগ্রামের পর বিরাট শুন্যতা ছিল রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি সর্বত্র। এককথায় একটি বিধ্বস্ত দেশকে গড়ার দুরূহ দায়িত্ব নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দীন আহমদ।

কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে কি দূর হয়েছে এসব প্রতিকূলতা? পূরণ হয়েছে কি মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সবচেয়ে বড় অর্জন। এছাড়াও একটি নবীন দেশে হিসেবে স্বাধীনতার প্রথম ৪১ বছরে অনেকটাই সফল বাংলাদেশ।

তবু রয়ে গেছে অপূর্ণতা। পাকিস্তান আমলে বপন করা দুর্নীতির বীজ আজ মহীরুহতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্থ দেশে পরিণত হয়েছে।[4] সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি ধ্বংস করে দিচ্ছে সকল উন্নয়ন প্রচেস্টাকে।

শ্রেণী বৈষম্য বেড়ে চলেছে। সৃষ্টি হয়েছে সর্বগ্রাসী বুর্জোয়া শ্রেণী, যার প্রকট ফলাফল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের লাগামছাড়া বৃদ্ধি। অপরিকল্পিত শিল্পায়ন হচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে কৃষি। যে বাংলাদেশ একসময় পৃথিবীর ৭০% পাট উৎপাদন করত, সেখানে পাট এখন একটি অপ্রচলিত দ্রব্য। স্বাধীনতার পর পর ধনিক দেশগুলো ও তাদের দাতাগোষ্ঠীসমূহ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো বাংলাদেশের ওপর। আজ তার ফলশ্রুতিতে দাতাগোষ্ঠীর রক্তচক্ষুর কাছে জিম্মি বাংলাদেশ। আইএমএফ প্রভৃতি দাতাগোষ্ঠীর বেঁধে দেয়া নিয়মে তৈরি হচ্ছে দেশের আইন ও পরিকল্পনা। দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নাক গলাচ্ছে বিদেশী পক্ষগুলো।[5]

[4] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল রিপোর্ট;২০০১-২০০৫

[5] জাতীয় দৈনিকসমূহ; ২০০৭-২০০৮ দ্রষ্টব্য।

meine schrift

বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই দেখে ফেলেছে দীর্ঘমেয়াদী দুটো সামরিক ও স্বৈরশাসন এবং একটি নেপথ্য সামরিক অস্থায়ী প্রশাসন, যা ছিল দেশের চুড়ান্ত রাজনৈতিক ব্যর্থতা ও অস্থিতিশীলতার ফসল। দেশের ৪০ বছরের মাঝে প্রায় ১৭ বছরই কেটেছে অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায়।

দেশে উদ্ভব ঘটেছে জঙ্গিবাদের। মৌলবাদ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে সমাজে, যার পেছনে বিরাট ভূমিকা রাখছে স্বাধীনতা বিরোধীরা।

এছাড়াও সন্ত্রাস, বেকারত্ব, শিক্ষার নিম্নমান, দারিদ্র্য ইত্যাদি নানা সমস্যায় আজো জর্জরিত বাংলাদেশ।

এমতাবস্থায় খুব সহজেই প্রতীয়মান হয় যে দেশ তাজউদ্দীন আহমদের মত একজন প্রতিভাবান নেতার অভাবে ভুগছে। ঠিক যেমনটা তিনি ভেবেছিলেন, পরিকল্পনা করেছিলেন দেশে নিয়ে, স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু থেকে স্বাধীনতার অব্যবহিত পর পর্যন্ত, ঠিক তাঁর সেই পরিকল্পনা, দক্ষতা আর দেশপ্রেমিক দর্শনের প্রয়োজন আজ সবচেয়ে বেশি।

দেশ নিয়ে তাঁর ভাবনা, পরিকল্পনা ছিল সুদূরপ্রসারী। যে যে দুর্বলতাগুলো তিনি চিহ্নিত করেছিলেন, যে যে ক্ষেত্রে তিনি উন্নয়নের চিন্তা করেছিলেন, আর সর্বোপরি যা ছিল তাঁর দর্শন বা কর্মপন্থা, আজ তার প্রকট অভাব বিদ্যমান।

<u>তাজউদ্দীন আহমদের কর্ম, দর্শন ও বাংলাদেশঃ</u>

একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদের মূল্যায়ন করতে গিয়ে প্রফেসর নুরুল ইসলাম বলেছেন,

“খুব সম্ভবত রাজনীতিতে দুটো জিনিষ লাগেঃ এক, ইনস্টিটিউশন দুই, মাস আপিল; জনগণের কাছে আবেদন সৃষ্টির ক্ষমতা। প্রথমটী তাঁর মধ্যে ছিল। কিন্তু দ্বিতীয়টি ততটা নয়। ..... গণরাজনীতি আসলে আবেগের রাজনীতি। কিন্তু তিনি (তাজউদ্দীন) ছিলেন বিশ্লেষক, মেথোডিক্যাল, সিস্টেম্যাটিক। বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্লেষনী ক্ষমতার অধিকারী এক সুযোগ্য রাজনীতিক।“[6]

[6] উল্লেখ; আতিউর রহমান;”অজেয় প্রাণশক্তির প্রবক্তা তাজউদ্দীন আহমদ”; “জাতীয় চার নেতা”; জাতীয় চার নেতা পরিষদ। পৃঃ ৮৩

meine schrift

বঙ্গবন্ধুর সম্মোহনী আবেদন আর তাজউদ্দীন আহমদের তীক্ষ্ণধী পরিকল্পনাই মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে এনে দেয় আন্তর্জাতিক সমর্থন, ঐক্য ও সর্বোপরি- সাফল্য। দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রেও যতদিন বঙ্গবন্ধু- তাজউদ্দীন সম্পর্ক জোরদার ছিল, ততদিন গৃহীত হচ্ছিল দক্ষ উন্নয়ন পরিকল্পনা।

মুক্তিযুদ্ধ ছিল তাঁর ধ্যন, তাঁর সাধনা। শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়ের দেখায়,

"প্রথমদিন থেকে আমাকে যে বিষয়টি অবাক করেছে তাহলো মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাজউদ্দীন আহমদের পুরোপুরি নিবেদিত থাকা। মুক্তিযুদ্ধ ছিল তাঁর ধ্যান। নিজেকে বাঁ পরিবার নিয়ে ভাববার কোনো সময় তাঁর ছিল না। ... সকাল সাতটা থেকে রাত এগারোটা নাগাদ একটানা কাজ করতেন। মাঝরাত পেরিয়ে সামান্য আহার করতেন।.....তাজউদ্দীন খুবই মেথোডিক্যাল ছিলেন। প্রতিদিন ডায়েরী লিখতেন। অস্থায়ী সরকার গঠনের সময় খসড়া ঘোষণা তৈরির কাজে তিন দিন তিন রাত যেভাবে খেটেছেন, অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে আলাপ করেছেন, নানা মতবিরোধকে নিজেদের ভেতরেই রেখে সামনে এগিয়ে গিয়েছেন, তা আমি অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি।"[7]

তাঁর এই গোছানো নিয়মতান্ত্রিক নেতৃত্ব পাবার সৌভাগ্য বাংলাদেশের হয়েছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের অব্যবহিত পরও।

আজ যখন দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এমন নিষ্ঠা, একাগ্রতার অভাব। যখন রাজনীতি পরিণত হয়েছে একটি লাভজনক ব্যবসায়। নেতাদের লক্ষ্য যখন যে কোন উপায়ে ক্ষমতা আত্মসাৎ। তখন তাঁর এই অবিচল একনিষ্ঠতাই হতে পারে মুক্তির নির্দেশনা। দেশসেবার আদর্শ সম্পদ নয়, এমন একাগ্রতাই হওয়া উচিৎ।

তাজউদীন আহমদ জানতেন কতটা বিভক্ত আর মতভেদে জর্জরিত বাঙ্গালী জাতি। তিনি জানতেন কেবল মুক্তিযুদ্ধের মত জাতীয় প্রয়োজনই পারে দীর্ঘদিন এই দ্বিধাবিভক্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে। তাই তিনি জাতি , ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব বাঙ্গালীকে আহবান জানানঃ

"বাংলাদেশের স্বাধীনতা এলো এক রক্তাপ্লুত ভূমিতে, এক ধ্বংসস্তুপের মধ্যে। জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা অনুজায়ী এই দেশকে নতুন করে গড়ে তোলার দায়িত্ব এখন আমাদের সামনে। দেশের দ্রুত পুনর্গঠনের কাজে আমরা ভারতের সহযোগিতা ও সাহায্য আমরা কামনা করব। শুধু পুনঃনির্মাণ নয়-নতুন সমাজ গঠনের দায়িত্ব আমরা নিয়েছি। সংগ্রামের কালে সমগ্র জাতির যে ঐক্য ও আত্মত্যাগের পরিচয় আমরা পেয়েছি, সেই ঐক্য ও ত্যাগের মনোভাব অটূট রাখতে হবে। তবেই

[7] ডেইলী টেলিগ্রাফ; ০১.০২.৯২; কলকাতা

গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের ভিত্তি দৃঢ় হবে। সেই নতুন আলোর পথে আমরা যাত্রা করলাম। "[৪] (১৭ই ডিসেম্বর ১৯৭১)

তাঁর আবেদন ছিল জনতার আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার একেবারে মূল বিষয়টাতেই। মুক্তিযুদ্ধ ছিল "আমাদের যুদ্ধ"। বিপদ ছিল আমাদের সবার। দাবী ছিল প্রত্যেকের দাবী। তেমনি যদি দেশটাকেও আমরা "আমাদের দেশ" হিসেবে দেখতে পারতাম আজো, তবে বর্তমান সংকটের প্রশ্নই উঠতো না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যদি আমরা ধরে রাখতে পারতাম, তাহলে এত বিভাজন হত না। তাজউদ্দীন আহমদেরা তাই চেয়েছিলেন। বাংলাদেশ হবে সবার দেশ। হিন্দুর বা মুসলিমের, ধনীর বা দরিদ্র্যের, বরিশাল বা ঢাকাবাসীর নয়। এটাই একটি সদ্যপ্রসূত জাতির অস্তিত্বের মূলমন্ত্র। স্বাধীনতা সংগ্রাম মানে সবকছুকে নতুন করে শুরু করা। শোষনের শেকল কেবল নয়, শোষনের সমস্ত চিহ্ন মুছে দিয়ে নতুন সমাজব্যবস্থা কায়েম করাই এই বিপ্লবের উদ্দেশ্য ও সাফল্য। যে সমাজ কাঠামো পুরনো, জীর্ণ শোষনের হাতিয়ার মাত্র তার নাম পরিবর্তন নয় কেবল। তার পরিবর্তন করা চাই আমূল। উপড়ে ফেলা চাই শোষনের বীজটুকু। সামাজিক শোষন একটি অনাকাঙ্ক্ষিত কলাগাছের মত। শিকর সহ উপড়ে না ফেলা হলে দ্বিগুণ গতিতে বিস্তার লাভ করে।

তাজউদ্দীন আহমদ তাই ছিলেন সমাজের আমূল পরিবর্তন আনার পক্ষেঃ

"সমাজের কাঠাম ব্যবস্থার কোনও একটি অংশ থেকে অন্যায় নির্মূল করার চেষ্টা বিষয়টিকে আরো জটিলতার দিকে নিয়ে জাবে.....তাই একটি সার্বিক আঘাত এবং পরিপূর্ণ পরিবর্তন এই অবস্থার সমাধান বলে মনে হয়।"[৯]

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এই আমূল পরিবর্তনের পরিকল্পনাই ছিল তাজউদ্দীন আহমদ ও বঙ্গবন্ধুর। বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দীন আহমদের প্রয়াণের পর তাই অসমাপ্ত পরিবর্তনের ওপর গড়ে ওঠে পুরনো শোষনের নতুন চারা। আজ তাই পাকিস্তানের ২৩ পরিবারের পরিবর্তে দেখতে পাই বাংলাদেশের অনেকগুলো শোষক পরিবারকে। তাই আজো রয়ে গেছে সেই পুরনো বৈষম্য।

আধুনিককালে একটি দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি একটি স্বনির্ভর শক্তিশালী অর্থনীতি। স্বাধীনতা উত্তর সময়টি ছিল বাংলাদেশের জন্য সেই অর্থনীতি গড়ে তোলার সূচনালগ্ন। এ সম্পর্কে তাজউদ্দেন আহমদ চিন্তা করেছেন তাঁর যৌবন থেকেই। তাঁর ডায়েরীতে লেখা আছে ,

"... জমির জাতীয়করণ করা সম্ভব নয়।"[১০]

---

[৪] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র; তৃতীয় খন্ড।

[৯] তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরীঃ ১ম খন্ড; ২৫।০৫,৫০

meineschrift

যুক্তি হিসেবে দেখিয়েছিলেন যে জমির প্রতি কৃষকদের রয়েছে নিবিড় টান। জাতীয়করণ বঞ্চিত করবে কৃষকদের জমির মালিকানা থেকে, ফলে সৃষ্টি হবে অসন্তোষ। আর যেহেতু জনগণের স্বার্থেই অর্থনীতি, তাই জনতার অধিকার হরণের কোন অর্থ হয় না।

দেশের শিল্প উন্নয়ন, বৈদেশিক সাহায্য ইত্যাদির ব্যাপারে তাঁর ছিল নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিঃ

"নারকেল ছোবড়া, বেত, মধু, কাগজ, কার্ডবোর্ড, পাট, সূতা ও বস্ত্রশিল্প (গড়ে তোলার কথা) উল্লেখ করলাম। আমি আই এম এফের অরথে সড়ক নির্মাণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করলাম। কারণ তাতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে। যুদ্ধের পর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মূল্যের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা।"[11]

এটা ছিল কামরুদ্দীন সাহেবের অনুরোধে তাঁর তৈরি আই এম এফ এর সাথে আলোচনার নীতি-সংক্ষেপ।

তাঁর এই নীতি ছিল একটি স্বনির্ভর অর্থনীতির দেশ গড়ে তোলার আদর্শ চেষ্টা। বঙ্গবন্ধুর সরকারের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে তিনি কঠোরভাবে মেনে চলেন এই নীতি। তিনি জানতেন বৈদেশিক সাহায্য বয়ে আনে বিদেশ নির্ভরতা আর বৈদেশিক চাপ। সাহায্যের বিনিময়ে দাতাগোষ্ঠী হাতিয়ে নেয় বিপুল পরিমাণ সুবিধা। যাতে করে দেশের সার্বভৌমত্ব হয়ে পড়ে হুমকির সম্মুখীন। এই নীতির প্রতি নিষ্ঠার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়, যখন ১৯৭২ সালে তিনি দিল্লীতে একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেন, আজকের বিশ্বে কোনো দেশ একে অন্যের সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না। এ জন্য পারস্পরিক সাহায্য- সহযোগিতার প্রয়োজন। তাই আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশ যে কোনো দেশের-ই শর্তহীন সাহায্যকে স্বাগত জানাবে।[12]

এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পুনর্গঠনের জন্য একক কোনো দেশের পরিবর্তে জাতিসংঘের UN Relief for Bangladesh মিশনের সাহায্য প্রার্থনা করে।

শীতল যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বুর্জোয়া রাস্ট্রসমূহের তৎপরতার বিরুদ্ধে এটা ছিল খুবই কার্যকরী একটি পন্থা। তদুপরি বুর্জোয়া বিশ্বের মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রবল প্রতিপক্ষ। পরবর্তীতে ৭১ এর মার্কিন সমরপতি ডেভিড ম্যাকনামারা আই এম এফ এর প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশে এলে, তাজউদ্দীন তাঁর বিখ্যাত,

---

[10] "তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরী"; ১ম খন্ড;৪ঠা আগস্ট ১৯৪৭;প্রতিভাস প্রকাশনী

[11] "তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরী";্প্রতিভাস প্রকাশনী।

[12] দৈনিক বাংলা; ২৯ শে জানুয়ারী ১৯৭২

"আমাদের প্রয়োজন গরু, গরু বাঁধার দড়ি আর কিছু কৃষি সরঞ্জাম" এই বক্তব্য দিয়ে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেন যে বাংলাদেশ আমেরিকার কূটচালের বলি হতে রাজী নয় এবং বাংলাদেশের বিপর্যয়ের পেছনে একটা মূল ভূমিকা রেখেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।[13]

জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাজউদ্দীন সমাজতন্ত্রকেই সঠিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে মনে করতেন। তাই বাংলাদেশের অর্থনীতিকে তিনি পুঁজিবাদের করাল থাবা থেকে নিরাপদ রাখতে চেয়েছিলেন।

বিশ্ব পুঁজিবাদের আধুনিক পন্থা হলো, দাতাগোষ্ঠীর মাধ্যমে সাহায্য দিয়ে দরিদ্র্য রাষ্ট্রগুলোকে বশীভূত রাখা। এজন্যে রাষ্ট্রগুলোতে সৃষ্টি করা হয় কৃত্রিম সংকট এবং বাধ্য করা হয় বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণে। বৈদেশিক সাহায্যের হাত ধরেই আসে বেসরকারীকরণ, পুঁজির বিকাশ ঘটানো, বৈদেশিক বিনিয়োগ নির্ভর অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলা, মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রচলন ইত্যাদির মত শর্তগুলো। আবার বৈদেশিক সাহায্যের সিংহভাগ নিজেদের পেছনে খরচ করার পর দাতা সংস্থাগুলো বাকি উচ্ছিষ্ট অর্থ ব্যয় করে স্থানীয় কর্তাব্যক্তিদের দুর্নীতিগ্রস্ত করার পেছনে। ফলে সৃষ্টি হয় অরাজকতা, ধ্বংস হয় দেশীয় শিল্প, বাড়ে বিদেশ নির্ভরতা, অর্থাৎ পুঁজিবাদী দেশগুলোর ব্যবসার সুযোগ সম্প্রসারিত হয় আরো।[14]

ঠিক এই প্রবণতাই দেখা যাচ্ছে বর্তমান বাংলাদেশে। বাংলাদেশের প্রধান আয়ের উৎস কৃষিতে ভর্তুকি কমছে বিশ্বব্যাংক, আই এম এফের চাপের কারণে। দেশে গজিয়ে উঠছে হাজারে হাজারে ভুঁইফোঁড় পুঁজিপতি। প্রত্যেকটি সরকার ক্ষমতায় এসেই ছুটছে বিভিন্ন দাতা সংস্থার কাছে। বাড়ছে বৈদেশিক ঋণ আর বিদেশ নির্ভরতা। অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ধ্বংস করছে দেশের কৃষি ও অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ।

যদি তাজউদ্দীন আহমদের গৃহীত নীতিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখা যেত তবে দেশে গড়ে উঠত পরিবেশ বান্ধব, দেশীয় শিল্প। বিদেশ নির্ভরতার বদলে আসত স্বয়ংসম্পূর্ণতা। বাংলাদেশ অচিরেই আত্মপ্রকাশ করত একটি শক্তিশালী অর্থনীতি হিসেবে।

তিনি এমন একটি উন্নয়ন কৌশল গ্রহন করতে চেয়েছিলেন, যাতে রাষ্ট্রীয়ভাবে পুঁজিবাদের প্রতি উৎসাহ দেখানো হবে না।[15]

---

[13] Nurul Islam; "*Making of a Nation: Bangladesh An Economist's Tale";* University Press Limited, 2005; pg:250

[14] আনু মুহাম্মদ; "বিশ্ব পুঁজিবাদ ও বাংলাদেশের অনুন্নয়ন";জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ পরিবেশিত; সংহতি প্রকাশন।

[15] দৈনিক পূর্বদেশ; ৭ই জুলাই ১৯৭৩

meine schrift

কিন্তু তাজউদ্দীন জানতেন, পশ্চিমা সমাজতন্ত্রের পাঠ বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য নয়। বাংলাদেশকে গড়তে হবে তার নিজস্ব পন্থা। তিনি বলেন,

"মানুষ যাতে অবাধে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারে সে জন্য রাষ্ট্রেযন্ত্রটি হবে গণতান্ত্রিক কিন্তু অর্থনৈতিক কাঠামো হতে হবে অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক।"[16]

তিনি কোন পরিবর্ধিত সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন না। তিনি জানতেন, কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে, যেখানে শ্রমিক শ্রেণীর আয়তন জনসংখ্যার তুলনায় নগণ্য, যেখানে মধ্যবিত্ত ও বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ ঘটে নি ঠিকমতো (৭০ দশকের প্রেক্ষিতে), সেখানে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব কেবল অলীক- ই নয়, বিপজ্জনক ও বটে। অর্থাৎ নিরেট সমাজতন্ত্র বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াত।

তাই তিনি বাংলাদেশের নিজস্ব পন্থা তৈরিতে সচেষ্ট হন। যেখানে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সুষম সমন্বয় ঘটবে। এক্ষেত্রে প্রথমত আসে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো।

তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রণীত হয় মুজিবনগর সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোর রূপরেখা। এতে একটি রাষ্ট্রের কাঠামোর প্রায় সার্বিক রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়।[17] এই কাঠামোর মূল বক্তব্য ছিল জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনকাঠামো গড়ে তোলা।[18]

যদিও নানা কারণে এই কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয় নি, তবু পরবর্তীতে ১৯৭২ এর সংবিধানে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের জন্য স্বীকৃত ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অধিকতর প্রতিনিধিত্বশীল ও বিকেন্দ্রীকরণের অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়, যার মূল লক্ষ্য চিল শোষণহীন, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা।[19]

পরবর্তীতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রণয়ন বিষয়ে বিপুল দাবী থাকা স্বত্বেও এখনো তা বাস্তবায়িত হয় নি। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সরকারে জনগণের অংশগ্রহন বৃদ্ধি করে। কেন্দ্রীয় সরকারের জবাবদিহিতার সুযোগ সৃষ্টি করে। এক দেখা হয় দৃঢ় গণতন্ত্রের লক্ষণ হিসেবে।

---

[16] দৈনিক বাংলা, ২১শে জুলাই,১৯৭২

[17] বাংলাদেশের মুকিজুদ্ধের দলিলপত্র; ৩য় খন্ড;পৃঃ৪৫৪-৫৭৩

[18] আবুল মাল আব্দুল মুহিত; "জেলায় জেলায় সরকারঃস্থানীয় সরকার আইনসমূহের বিবরণ";ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড;২০০২; পৃঃ ৬৮-৬৯

[19] Shyamoli Ghosh; "Constitutional Changes in Bangladesh"; India Quarterly;Vol:XLII;No,4;Oct-Dec;1986;pgs:392-393.

meine schrift

অর্থাৎ, তাজউদ্দীন আহমদের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশাসন কাঠামো তৈরি হলে, বাংলাদেশ বেরিয়ে আসত পাকিস্তানি সময়ের কেন্দ্রীয় আমলাতান্ত্রিক শোষন কাঠামো থেকে। যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, তার পূর্ণরূপ দেখা যেত। জনগণের অংশগ্রহণের সরকারে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন হত। ফলে জাতীয় ঐক্য অটুট রাখা সহজ হত।

বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেয় ১৯৭৩-৭৪ ও ১৯৭৪-৭৫ সালের চিত্র। যখন দুর্নীতি, লুটতরাজ, দ্রব্যের লাগামছাড়া চড়ামূল্য, কতিপয় ব্যক্তির রাতারাতি ধনী হবার অপপ্রয়াস, মজুদদারী ইত্যাদিতে নিমজ্জিত হয় দেশ। তবে পার্থক্য হল তখনকার রাজনৈতিক অবস্থাও ছিল সমান শোচনীয়।

সেই সময়ে, যখন তিনি ছিলেন বিরোধী পক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত, যারা বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর সম্পর্ক বিনষ্টকরণের মাধ্যমে সুবিধা আদায় করতে চেয়েছিল, যখন বেশিরভাগ নেতা পরিণত হয়েছিলেন সুবিধাভোগী দুর্নীতিবাজ এ, তখনও তাজউদ্দীন আহমদ অটল ছিলেন তাঁর নীতিতে। তৎকালীন অরাজক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তিনি বলেছিলেন,

"...আমরা যদি দেশের মানুষকে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও বস্ত্র সরবরাহ করতে ব্যর্থ হই বাঁ তাদের প্রয়োজন মেটাতে না পারি, তবে আমাদের দেশেও বিপ্লবের নিষচাপ সৃষ্টি হবে এবং যদি সময় থাকতে মানুষেড় কল্যাণ প্রচেষ্টায় ব্রতী না হই, তাহলে নিষচাপের ফলে অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের,গতিধারায় আমরা শুধু ভেসেই যাব না, ইতিহাসের কলংকজনক অধ্যায়েও নিক্ষিপ্ত হব।"[20]

এ সময় তিনি প্রায়ই সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যেতেন বাজারের অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে এবং কিছু অপরাধীকে হাতেনাতে ধরেও ফেলেন।[21]

তাজউদ্দীন আহমদ শুরু থেকেই কৃচ্ছতা সাধনের পক্ষে ছিলেন এবং নিজে যেমন কৃচ্ছতা সাধন করতেন তেমনি জনগণের প্রতি তাঁর আহবান থাকত তা। তিনি এমনকি অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাড়ি ও গ্রামের সংস্কারও করেননি এই বলে যে, তিনি বাংলাদেশের অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী, সমগ্র দেশের আর্থিক মঙ্গল করা তাঁর দায়িতব,কাজেই সারা দেশে অসংখ্য গৃহহারা মানুষের পুনর্বাসন বাঁ সারা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার না করে তিনি নিজের বাড়ি ও গ্রামের উন্নয়ন কিভাবে করবেন?[22]

---

[20] দৈনিক ইত্তেফাক; ১৯শে জানুয়ারি;১৯৭৪

[21] সিমিন হোসেন রিমি; "আমার বাবার কথা"; পৃঃ৬৮-৬৯।

[22] সিমিন হোসেন রিমি, "আমার ছোটবেলা ১৯৭১ এবং বাবা তাজউদ্দীন আহমদ"; প্রতিভাস;২০০১;পৃঃ ১২৯-১৩০

meine schrift

কিন্তু এই প্রচন্ড কর্মতৎপর, আদর্শবাদী , দক্ষ ও দেশপ্রেমিক মানুষটিকে তাঁর কাজ অপূর্ণ রেখেই বিদায় নিতে হয়। চক্রান্তকারীরা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে প্রথমে ফাটল ধরায় তাঁর সাথে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কের। তারপর তাঁর ও বঙ্গবন্ধুর খন্ডিত শক্তির সুযোগ নিয়ে একে একে নৃশংসভাবে হত্যা করে বাংলার এই শ্রেষ্ঠ দুই সন্তানকে।

স্বাধীনতা উত্তর আওয়ামী সরকারের ব্যর্থতার দায় কোনমতেই বঙ্গবন্ধু বা তাজউদ্দীন আহমদের ওপর বর্তায় না। তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন অসময়ে এক যোগ্য মানুষ। তাঁর সবটুকু দিয়ে তিনি সেবা করেছেন দেশের। একাগ্র দেশপ্রেমিকের নিষ্ঠতায় চেয়েছেন দেশকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিতে। সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও যুদ্ধবিদ্ধস্ত একটি জনপদকে দিয়ে গেছেন উঠে দাঁড়াবার ভিত্তি।

<u>মুল্যায়নঃ</u>

আগেই বলা হয়েছে তাজউদ্দীন আহমদ সমাজে পূর্ণাঙ্গ পরিবর্তন চাইতেন। তাই তাঁর পন্থা ছিল দেশকে একটি সম্পূর্ণ নতুন ভিত্তি দেয়া, যার ফল হবে সুদূরপ্রসারী। তাঁর গৃহীত পদক্ষেপগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে, জনতার জোয়ারকে অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে কাজে লাগিয়ে এক নতুন সমাজের সূচনা করতে চেয়েছিলেন তিনি।

একটি সমৃদ্ধ জাতির উন্নতির শর্ত হলো ঐক্যবদ্ধ পথে নিরন্তর এগিয়ে যাওয়া। সূচনালগ্নে সমস্ত জাতির ইতিহাসেই মতবিরোধ, দ্বন্দ, সংঘাত পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সাফল্য তখনই আসে যখন সব কিছু ছাপিয়ে থাকে উন্নয়নের নির্দিষ্ট কিছু জাতীয় প্রচেষ্টা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস থেকে দেখা যায়, ব্যাংক ব্যবস্থা প্রচলন, একচেটিয়া মুনাফা লাভ, সীমান্ত সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ ছিল নীতিনির্ধারকদের মাঝে। যার ফলশ্রুতিতে প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড্রু জ্যাকসনসহ অনেককে হত্যার প্রচেষ্টা করা হয় এবং কয়েকজন প্রেসিডেন্ট নিহতও হন।

সবশেষে আব্রাহাম লিংকনের শাসনামলে দাসপ্রথা রহিতকরণ নিয়ে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। কিন্তু সমস্ত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে মার্কিন জাতি ঠিকই প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীনতার লক্ষ্য। যা ছিল তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল স্বপ্ন।

কিন্তু বাঙ্গালীর স্বাধীনতার স্বপ্ন বারবার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। স্বাধীনতার ৪১ বছর পর, আজো দারিদ্র্য দেশের জন্য একটা বড় হুমকি। বিশ্বে আজো বাংলাদেশের পরিচিতি দরিদ্র্য দেশ হিসেবে।

meine schrift

এখনো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে পারে নি। সরকার নিজেই অহরহ পড়ছে অর্থ সংকটে। ফলে বাড়ছে ঋণের পরিমাণ। তাই বাড়ছে বিদেশ নির্ভরতা আর দাতাদের চোখ রাঙানি। জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি যাচ্ছে। বিদেশীরা নাক গলাচ্ছে আভ্যন্তরীণ বিষয়ে। সার্বভৌমত্ব হচ্ছে খর্বিত।

রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়ছে। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ বেড়ে চলেছে। বেড়ে চলেছে রাজনৈতিক কোন্দল ও সংঘর্ষ। এর সুযোগ নিচ্ছে স্বাধীনতার পুরনো শত্রুরা। নতুন করে উদ্ভব হচ্ছে মৌলবাদ ও জংগীবাদের।

দেশ তার প্রাথমিক এবং মৌল লক্ষ্য, গনরতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি থেকে সরে এসেছে। জাতীয়তাবাদ জলাঞ্জলি যাচ্ছে ব্যক্তি স্বার্থের কাছে।

রাজনীতিতে ঘটছে নীতির তিরোভাব। আর আবির্ভাব ঘটছে ব্যবসায়ের। রাজনীতি এখন কালোটাকা ও পেশীশক্তির খেলা।

সমাজে পুঁজিবাদ জেঁকে বসেছে। বৈষম্য বাড়ছে ধনী-গরীবের। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যারা ছিল বাংলার প্রতিটি সংগ্রামের প্রধান উদ্গাতা, তার লোপ পেয়ে যাচ্ছে। যথেচ্ছ মুনাফাবাজি, মজুদদারী, ভেজাল, সন্ত্রাস ইত্যাদির অত্যাচারে দেশ দিশেহারা।

অথচ তাজউদ্দীন পরিকল্পনা করেছিলেন অন্য এক দেশের, অন্য এক পরিস্থিতির। আমাদের জাতিরে মাঝের ভেদাভেদ, মতবিরোধ, রেষারেষি এই সমস্তকিছু মাথায় রেখেই তিনি কাজ করে যাচ্ছিলেন দেশের স্বার্থে।

শুরুতেই তাঁর মুক্তির চেতনাকে কাজে লাগিয়ে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখার চিন্তা ছিল একেবারেই মৌলিক চাহিদা এবং যথোপযোগী পদক্ষেপ। একটি জাতির উন্নতির প্রধান শর্ত হল এই চেতনার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। এটাই জাতীয় চেতনা। জাতীয়তাবোধ।

তাজউদ্দীন আহমদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত হলে নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ এখন একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হত নিদেনপক্ষে। তাতে নিশ্চিত হত তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। কারণ তখন বিদেশী প্রভূদের কাছে মাথা নত করে থাকতে হত না সাহায্যের জন্য।

তাঁর বিকেন্দ্রীকৃত ও জনপ্রশাসন কেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করত প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণ। তাতে নিশ্চিত হত শাসকশ্রেণীর জবাবদিহিতা। ফলে দেশের মানুষ গণতন্ত্রের সুফল ভোগ করতে পারত।

meine schrift

তাজউদ্দীন আহমদের দেশকে নিয়ে পরিকল্পনা ছিল সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। তা ছিল সুদূরপ্রসারী। ধাপে ধাপে দীর্ঘ সাধনায় অর্জিত হতো মুক্তিযুদ্ধের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। হয়তো তার সুফল পাওয়া যেত না সহসা। কিন্তু তার পরিণতি হত সুনিশ্চিত। একসময় সুফল ফলত জনগণের সাধনার বৃক্ষে।

তাজউদ্দীন আহমদের পথ যেন ছিল বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে একটি শক্ত সূতোর মত। যে সূতো ধরে নিরবচ্ছিন্ন পথ চললে উন্নতির স্বর্ণশিখরে পৌঁছত দেশ। কিন্তু ১৯৭৫ ছিঁড়ে দেয় সে সূতো।

আজ, স্বাধীনতার ৪১ বছর পর, যেমন মুক্তিযুদ্ধের সে চেতনা বিরল, তেমনি বিরল তাজউদ্দীন আহমদের মত নেতা। যিনি একাধারে যুক্তিবাদী, তীক্ষ্ণধী, নিষ্ঠ ও দেশপ্রেমিক। আজ বাঙ্গালী জাতি বোধ করছে সেই চেতনার অভাব। তাই তারা আজ পথহারা।

বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দীনরা যেন ছিলেন নেকড়ের পালে সিংহের মত। যথেষ্ট শৌর্য ও দক্ষতার অধিকারী হয়েও তাঁরা ব্যর্থ হন নেকড়েদের ষড়যন্ত্রের কারণে। এই ব্যর্থতা বাঙ্গালীর ব্যর্থতা, তাঁদের নয়। কারণ এমন দুর্লভ ও প্রতিভাধর নেতা পেয়েও তার কদর করতে পারল না এই জাতি। তাঁদের হাত ধরে পৌঁছতে পারল না উন্নতির স্বর্ণশিখরে।

meine schrift

সহায়িকাপঞ্জি

গ্রন্থ ও মুদ্রিত সূত্রঃ

১। "তাজউদ্দীন আহমেদ, নেতা ও মানুষ"—মাহবুব করিম সম্পাদিত- জাগৃতি প্রকাশনী-জানুয়ারী ২০০৩

২।জোছনা ও জননীর গল্প-হুমায়ূন আহমেদ-অন্যপ্রকাশ_–ফেব্রুয়ারী ২০০৪

৩। "Tajuddin Ahmed: A Man who Came before his Time", The Daily Star, Volume 9 Issue 44, November 12, 2010"

৪। "আমার বাবার কথা" – সিমিন হোসেন রিমি-সন্ধানী প্রকাশনী-১৯৯৪

৫।^ Midnight Massacre In Dacca"-- Sukharanjan Dasgupta, 1978, ISBN 0-7069-0692-6

৬। "আমাদের অলক্ষ্যেই মন্ত্রী ঘরে ঢুকলেন" ও ধারাবাহিকের অন্যান্য অংশ—দৈনিক প্রথম আলো, ২০০৬

৭। '৭১ -

ওয়েবসাইটঃ

১।http://www.liberationwarmuseum.org/

২।http://www.hindustantimes.com/News-Feed/BooksNews/book-on-tajuddin-ahmed-revives-old-memories/Article1-315802.aspx

৩। http://tajuddinahmad.com/daughters-tribute-to-our-guiding-light-tajuddin-ahmad

ভিডিওঃ

১। "নিঃসঙ্গ সারথী"—তানভীর মোকাম্মেল

২।"তাজউদ্দীন কন্যার কিছু না বলা কথা ও ব্যক্তিগত অনুভূতি"

http://www.youtube.com/watch?v=SiWSaLy_qFE

meine schrift

meine schrift